১.লিখিত সংবিধানঃ এ সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। এ সংবিধানে *১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ,* ৮২টি পৃষ্ঠা এবং ৭টি তফসিল আছে।

২.দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানঃ এ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। তবে এই সংবিধান সংশোধন করা খুব কঠিন কোন কাজও নয়! সংবিধানের দশম ভাগে মাত্র একটি অনুচ্ছেদ আছে- *১৪২*। এতে বলা আছে- বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়।

৩. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিঃ জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এই চার মূলনীতিকে আদর্শ ধরে কাজ পরিচালনা করেন।

৪. সংবিধানের প্রাধান্যঃ সংবিধানের *৭ নং অনুচ্ছেদে* বলা আছে- প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

৫. সংসদীয় সরকারঃ বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ তাঁর কাজের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকে।

৬. এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থাঃ বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক বিশিষ্ট সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এখানে সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার অধিকারী। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হওয়ায় এখানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে।

৭. এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাঃ এখানে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে আর এর নাম হল "জাতীয় সংসদ "। ১৯৭২ সালের সংবিধানে মোট ৩১৫টি সংসদ সদস্যদের জন্য আসন বরাদ্দ ছিল যার ভিতর ৩০০টি সাধারণ আর ১৫টি ছিল সংরক্ষিত নারী আসন। বর্তমানে এর সংখ্যা ৩০০+৫০ করা হয়েছে।

৮. মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তাঃ আমাদের সংবিধানের ৩য় বিভাগে এই বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এর মধ্যে চিন্তা করা, মতামত প্রকাশ, ধর্ম-কর্ম করা, চলা-ফেরা করা, বাক স্বাধীনতা,সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি বিষয়াবলী বর্ণিত হয়েছে। তবে এসকল অধিকাংশ অধিকারের উপর সংসদ বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে।

৯. জনগণের সার্বভৌমত্বঃ গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে সকল ক্ষমতার উৎস হল জনগণ। এ দেশের সরকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এদেশের সরকার ভূত-ভবিষৎ জনগণের উপর নির্ভরশীল।

.সার্বজনীন ভোটাধিকারঃ এখানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক ভোট এক নীতি হল বাংলাদেশের সার্বজনীন ভোটাধিকারে মূল ভিত্তি। আঠারো বছরের অধিক নাগরিকগণ এখানে জাতীয় যেকোন বিষয়ে ভোট দিতে পারবে।

১১. মানবাধিকার সমুন্নত রাখাঃ সংবিধানে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মানুষকে যেন অন্যায়ভাবে হত্যা না করা হয়, কারও সম্পদ যেন লুণ্ঠণ করা না হয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১২. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালঃ সাধারণ বিচার বিভাগ ছাড়াও এখানে এক ধরনের বিশেষ প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল আছে যেখানে প্রশাসনের সকল উর্ধ্বতন, অধঃস্তন কর্মকর্তা, কর্মচারীদের চাকুরীর বদলি পদন্নতি,বরখাস্ত ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালের হস্তক্ষেপ থাকবে।এ ধরনের ট্রাইবুন্যাল ভারত, যুক্তরাষ্ট্র,ব্রিটেনসহ অনেক দেশে নেই।

১৩. অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাঃ সংবিধানের *১৭ অনুচ্ছেদে* এই কথা বলা হয়েছে।সকলে যেন অত্যন্ত পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারে এব্যাপারে সরকারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৪. জেলা প্রশাসনঃ সংবিধান জেলা প্রশাসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনকে শাসনের মধ্যমণি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য মনোনীত হন।

১৫. দলীয় শৃংখলাঃ *৭০ অনুচ্ছেদে* এ আইন রয়েছে। যেন সকল সংসদ সদস্য দলীয় শৃংখলা সঠিকভাবে পালন করতে পারে এর জন্য কেউ যেন স্বীয় রাজনৈতিক দলের বিরুদ্বে সংসদে বক্তব্য না রাখে কিংবা দল ত্যাগ না করে। যদি তা সে করে তাহলে তার সংসদ পদ স্থগিত বলে ঘোষণা করা হবে।

১৬. ন্যায়পালঃ এটি সংবিধানের *৭৭ অনুচ্ছেদে* অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এখানে বলা হয়যে, "সংসদ আইনের মাধ্যমে ন্যায়পাল সৃষ্টি করবে। ন্যায়পাল সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারকের মত ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তিনি বাংলাদেশের সরকারের যেকোন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্বে আনীত অভিযোগ শুনবেন এবং প্রয়োজনে দণ্ডাজ্ঞা

দিতে পারবেন এবং যেকোন কর্তৃপক্ষকে তার নিকট জবাবদিহি করেত বাধ্য থাকবে ”।

১৭. সুপ্রিম কোর্টের ব্যবস্থাঃ সংবিধানে এই সুপ্রিম কোর্ট কাউন্সিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জিয়ায়ুর রহমানের সময় তা কেবলমাত্র কাউন্সিল করা হয়। এখানে প্রধান বিচারপতি আর অন্যান্য দুই জন সিনিয়র বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে যা বিচারকদের আচরণ বিধি নির্ধারণ করবে

১৮. জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধানঃ ৩য় সংশোধনের মাধ্যমে তা করা হয়। রাষ্ট্রপতি যদি কোন অবস্থায় দেখতে পান যে, দেশের বিশৃংখলা অবস্থা বিরাজমান তখন রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা জারী করতে পারবে।

১৯. প্রজাতন্ত্রঃ বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ। জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক। জনগণের পক্ষে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। রাষ্ট্রপতি হবেন দেশের সর্বাধিনায়ক এবং তিনি নামে মাত্র দেশ পরিচালনা করবেন। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেনা

২০. বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতাঃ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগকে সুপ্রিম কোর্ট বলা হয়।আপিল বিভাগ আর হাইকোর্ট নিয়ে এই কোর্ট গঠিত। সংবিধানের *২২নং অনুচ্ছেদে* বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা থাকার কথা বলা হয়েছে।

২১. স্বাধীন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাঃ বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও শ্রেণীসংগ্রাম বা বিপ্লবের কথা হয় নাই। জাতীয় সংসদ প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয়করণ করতে পারত।

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে : এক কেন্দ্রিক সংসদীয় বা পার্লমেন্টারি।

বর্তমানে সরকার প্রধান হলেন : প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো তিন ভাগে বিভিক্ত : ১। নির্বাহী/শাসন বিভাগ; Prime minister এর অধীন।

– : ২। আইন বিভাগ; জাতীয় সংসদ। Speaker এর অধীন।

– : ৩। বিচার বিচাগ; প্রধান বিচারপতির অধীন।

শাসন বিভাগকে : নির্বাহী বিভাগ ও বলা হয়ে থাকে।

– : এটি মূলত রাষ্ট্রপতি, প্রধান্মন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে গঠিত।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচীত হবার সর্বনিম্ন বয়স : ৩৫ বছর। তিনি জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।তিনি সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী এবং সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার।সংসদ আহবান, স্থপিত বা ভেঙে দেয়ার ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতির।রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর নিয়োগ দেন : রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারী করতে পারেন : রাষ্ট্রপতি সম্মতি ছাড়া কোন বিল পাস করা যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন : রাষ্ট্রপতি ।প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন সংসদ কর্তৃক গ্রহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার : ১৫ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দান করবেন।কোন বিল আইনে পরিণত হবে না : রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া ।আদালতের এখতিয়ার নেই : রাষ্ট্রপতির উপর রাষ্ট্রপতিরকে অপসারণ করতে পারে : জাতীয় সংসদ।

বাংলাদেশে সংবিধান

প্রধানমন্ত্রী,স্পিকার, মন্ত্রী হবার সর্বনিম্ন বয়স : ২৫ বছর।সংবিধান অনুযায়ী সরকার প্রধান : প্রধানমন্ত্রী।

সরকারের প্রধান আইনজীবী হলেন : এটর্নি জেনারেল।

বাংলাদেশের আইন সভার নাম : জাতীয় সংসদ।

- : এটি এক কক্ষ বিশিষ্ট।

- : আইন সভা বা জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে।

মন্ত্রীদের উত্থাপিত বিল হল : সরকারি বিল সংসদ সদস্যের উত্থাপিত বিল : বেসরকারি বিল ।ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রয়েছে : সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ।

অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলীর জন্য বাংলাদেসের কেবিনেট বা মন্ত্রীগণ দায়ী থাকবে : জাতীয় সংসদের কাছে।

বিচার বিভাগ : -

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত : সুপ্রিম কোর্ট এর দুটি বিভাগ হাই কোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ।কোর্ট অব রেকড বলা হয় : সুপ্রীম কোর্টকে ।সুপ্রিম কোর্ট এর প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন : রাষ্ট্রপতি।বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক : সুপ্রিম কোর্ট।সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান এবং অপরাধীর দন্ড প্রদান : বিচার বিভাগের কাজ ।

বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের সব ক্ষমতা : জাতীয় সংসদের।যে কোন নতুন আইন প্রণিয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন সংশোধন করতে পারে : জাতীয় সংসদ ।কোন নতুন পাস করতে হলে খসড়া বিলের আকারে : সংসদে পেশ করতে হয়।মন্ত্রীদের উত্থাপিত বিলটি আইনে পরিণত হয় : মন্ত্রীদের উত্থাপিত বিল বা সরকারি বিল যাচাই-বাচাই শেষে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হলে এবং রাষ্ট্রপতি কতৃক স্বাক্ষরিত ।বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থার ধরন : পার্লামেন্টারি।মন্ত্রীপরিষদ তাদের কাজকর্মের জন্য : জাতীয় সংসদের কাছে দায়বন্ধ।

প্রশাসনিক পূনর্বিন্যাস ও সংস্কার : -

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল (১৯৭২-৭৫) : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও বিভিন্ন প্রশাসনিক পূনর্বিন্যাস ও সংস্কার কমিটি গঠন এবং তাদের প্রণীত সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে কিছুটা সংস্কার হয়েছে।

-:-

সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রেস্টোরেশন কমিশনঃ : ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি প্রথম বারের মত প্রশাসনিক সংস্কারের একটি রুপ রেখা নিয়ে এ একটি সুপারিশ প্রণয়ন করে।

- : এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাদেশিক সচিবালয়কে জাতীয় সচিবালয় রুপান্ত্রিত করা হয়।

- : এতে ২০টি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, বিভাগ ও স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা রাখা হয়।

জিয়াউর রহমান শাসনামল (১৯৭৬-৮১) : ১৯৭৬ সালে পে অ্যান্ড সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়।

- : এর সুপারিশমালা ব্যাপকভাবে সরকার কতৃক কার্যকর হয়।

এরশাদ সরকার শাসনামল (১৯৮২-৯০) : মার্শাল ল কমিটিঃ মার্শাল ল কমিটিকে দায়িতে দেয়া হয় মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তর গোলর গঠন কাঠামো পরীক্ষা করে দেখা এবং বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করার।

খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনামল (১৯৯১-৯৬) : ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতার আসার পর উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করা হয়।

শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামল (১৯৯৬-০১) : স্থানীয় সসরকার পদ্ধতি পূনর্গঠন কমিশনঃ কমিশন সথানীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে জরিপ চালিয়ে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন, পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ নামে চার স্তরের স্থানীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করে।

খালেদা জিয়ার দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনামল (২০০১-২২০৬) : এ সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদাশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে দুটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করেছে।

শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনামল (২০০৯-২০১৪) : প্রশাসনে জ্যেষ্ঠ সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়।

- : পলিশ বাহিনিকে প্রশাসন বিভাগের নিইয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে কতিপয় উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

শেখ হাসিনার তৃতীয় মেয়াদের শাসনামল (২০১৪---) : সম্প্রতি এটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে।